Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# বেগম রোকেয়ার পদ্মরাগ



| | |
|---|---|
| Volume | 40 |
| Issue | 3 |
| Year | 1997 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | রাশিদা জামান |
| Published online | February 1, 1997 |
| DOI | 10.62328/sp.v40i3.3 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.3 |
| Pages | 51-64 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

# বেগম রোকেয়ার *পদ্মরাগ*

**রাশিদা জামান**

আধুনিক যুগ ও জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতাই *পদ্মরাগ*[১] উপন্যাসের বিশিষ্টতা। ১৯২৪ সালে (১৩৩১ বঙ্গাব্দ, বেগম রোকেয়ার *পদ্মরাগ* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর লেখা একমাত্র উপন্যাস। এ উপন্যাসের মূলকাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে অনেকগুলো শাখা-কাহিনী। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতেও নাটকীয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রেল স্টেশনে উপন্যাসটির শুরু এবং রেল স্টেশনেই উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। উপন্যাসের শুরু ও শেষ দেখলে মনে হয়, জীবনের গতিপথের বৈচিত্র্যই এখানে মুখ্য উপাদান।

বেগম রোকেয়া উপন্যাসের নিবেদনে যা লিখেছেন তাতে মনে হয়, একটি মুক্ত, উদার এবং অসাম্প্রদায়িক মন নিয়ে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে জীবন পর্যবেক্ষণেই তিনি আগ্রহী।

*পদ্মরাগ* উপন্যাসে তিনি মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিস্টান আইনে নারীর প্রকৃত অবস্থান ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখেছেন, প্রত্যেকটি আইনের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা করে সমাজ নারীকে বঞ্চিত করছে। বিশেষত, নারীর উত্তরাধিকার আইনের সুযোগ নিয়ে তাকে নির্যাতন ও নিপীড়ন করা হয়েছে। এ উপন্যাসে তিনি নারীর জীবনকে মানবিক ভিত্তির উপর স্বাবলম্বী করে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, উপার্জনক্ষম নারী যথার্থ স্বাধীন। সমাজের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার একমাত্র উপায় তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

পদ্মরাগ রূপে জয়নবের আশ্রয় সাময়িকভাবে তারিণী ভবন। কিন্তু যথার্থ মুক্তি আত্মপোলব্ধিতে, স্বাধীন কর্মনির্বাচনে। পরনির্ভরতা বা পরাশ্রয়ী জীবন থেকে নারীকে চিরতরে মুক্ত করতে চেয়েছেন তিনি।

সমাজের চোখে যে নারী ছিল পরনির্ভরশীল, অবহেলিত, নিন্দিত ও পরিত্যক্ত সেই নারীকে তিনি স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এ কারণে *পদ্মরাগ* উপন্যাসের প্রতিটি নারীচরিত্রই অসাধারণ।

।। এক ।।

সভ্যতার দিকে জীবনের অগ্রসরমানতার পেছনে দুদিক থেকে যে-দুটি শক্তি কাজ করছে, তার একটি হচ্ছে বাইরের; আর অন্যটি অন্তরের। বাইরের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের মেধা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও যুক্তিবাদ। অন্যদিকের মন ও মনন আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের কর্মকে এগিয়ে নিয়ে চলছে। মানুষের পূর্ণ পরিচয় অন্বেষণে, মানুষের এই সংগ্রামে, একক মানুষ বিশ্ব-মানুষের সংলগ্ন সত্তা।

সাম্প্রতিককালের নারী আন্দোলনের স্বরূপ বুঝতে হলে মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসের সম্যক পরিচয় জানা দরকার। পৃথিবীর ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও জাতির কার্যক্রমের পরিবর্তন ঘটে। দেশ ও জাতির এই পরিবর্তন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক। সমাজ-জীবনের বিশ্লেষণেই জাতিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তনের রূপটি ধরা পড়ে। এই ব্যক্তি নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। তার দ্বন্দ্ব জটিল ও সংগ্রামী রূপটিতে এই ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে।

অন্তরের দিক থেকে ব্যক্তি তার চিরকালীন ঐশ্বর্য অর্থাৎ, মানবিক অনুভূতি : প্রেম, ভালবাসা, মমতা, মহত্ব, ঔদার্য আত্মত্যাগ এগুলির প্রতি রক্ষণশীল। অন্যদিকে স্বার্থ, ক্ষমতা ও শক্তির মোহে সে অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত। লোভ, দ্বেষ, হিংসা, প্রতিহিংসার প্রলয়ঙ্করী শক্তির বশীভূত হয়ে সে অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপটি দেশ-কাল-জাতির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ভেতরে আত্মবিরোধী শক্তিরূপে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রবৃত্তি-চিহ্নিত শক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চলছে আদর্শাভিসারী, স্বপ্ন ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠাকামী মানবসত্তার। যুদ্ধলিপ্সু, ক্ষমতালোভী, দাম্ভিকরূপটি পুরুষের; আর নির্যাতিত নিগৃহীত রূপটি নারীর। উভয়েই মানবসত্তার বিপর্যস্ত অবস্থাকে মূর্ত করে তুলছে। সেখানেই এগিয়ে আসছে মানুষ হিসেবে মানুষকে পূর্ণ মর্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠার কামনায় মানবতাবাদী চিন্তা ও চেতনা। বেগম রোকেয়া নারীকে মানুষ হিসেবে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে আহ্বান করেছেন। এ ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর স্বার্থ যে অভিন্ন তিনি সে-বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। *পদ্মরাগ* উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে তাই পুরুষ ও নারী সংসারের ভেতরেই নয়, বাইরেও সহযাত্রী, কর্ম সাধনা ও লক্ষ্য তাদের অভিন্ন।

উপন্যাস চিত্রিত করতে চায় পূর্ণাঙ্গ জীবনের রূপ। ঔপন্যাসিক, তাঁর নির্ধারিত জীবন পটভূমিকে, তাঁর শৈল্পিক সত্তার বিচিত্র দিক দিয়ে উদ্‌ঘাটিত করতে চান। উপন্যাসের আঙ্গিক তার উপকূলের সীমারেখা ভেঙে নিত্য-নতুন খাতে প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনায় বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। সেই সঙ্গে, যদিও একটি মাত্র উপন্যাস রচনা করেছেন, তবু বেগম রোকেয়া

সাখাওয়াৎ হোসেনের *পদ্মরাগ* উপন্যাসটির বাস্তব-প্রেক্ষিত আলোচনা করলে সমকালীন উপন্যাসের ধারায় এর বৈশিষ্ট্যও ঔপন্যাসিক রোকেয়ার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

রবীন্দ্রনাথের *গোরা*[২] ও শরৎচন্দ্রের *শেষ প্রশ্ন*[৩] উপন্যাসের চরিত্রগুলো সমকালীন জীবন ও জগতের সংঘাতের প্রতিক্রিয়ার মুখর, তর্কবিতর্কে ক্ষত-বিক্ষত। চরিত্রগুলো অন্তরে বাইরে দুই দিকেই আহত। এই আহত মানবসত্তা স্বপ্নচারী, আদর্শাভিসারী ও কল্যাণকামী। একই সঙ্গে সে-মানুষগুলো নিজেরাই তাদের প্রতিকৃতি ও চরিত্রবন্দী। অন্যদিকে এই সীমাকে সে নিজেই ভেঙে এক বিমূর্ত মানবসত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ। দৈনন্দিনতাকে অতিক্রম করে চিরকালীন জীবনযাত্রায় কর্মকে প্রবাহিত করতে চায়। তাদের আত্মত্যাগের প্রেরণাই তাই। এই বিমূর্ত আত্মপ্রতিকৃতি এক জীবনে সম্পূর্ণ নয়। এই সত্তাই জীবন থেকে জীবনে সঞ্চারিত। সমকালে এই ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা-অভিসারী রূপ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে প্রতিফলিত হয়ে একটি কল্যাণ চিন্তাকে মূর্ত করে তোলে। এভাবেই এই শুভ চিন্তা সমকালকে অতিক্রম করে কাল থেকে কালে, সমাজ ও জাতির অগ্রগতির ধারার পেছনে, নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে নারী চরিত্রের এই অন্তর্গত কল্যাণশক্তি পুরুষের অন্তর-শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, নতুন সমাজ ও জীবন সৃষ্টির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। এই কল্যাণশক্তি কোথাও-বা পুরুষের অসহায় পৌরুষকে আহত, ক্ষুব্ধ ও রক্তাক্ত করেছে, বিপ্লবের বীজ তার অন্তরে প্রোথিত করে তার আত্মাহুতি ঘটিয়েছে। গৃহদাহের মহিম অসীম সহিষ্ণুতায় সুরেশ ও অচলার ব্যর্থ জীবনের রক্তাক্ত স্বাক্ষর হৃদয়ে বহন করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভেঙে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থার ভাঙনের তীরে। উপন্যাসের শিল্পসার্থকতা ঘটনার বিচিত্র প্রবাহ, চরিত্রের দ্বন্দ্ব সমাকালীনতা ও চিরকালীনতার সংঘাত ইত্যাদির কোন একটির মধ্যে নয়, সব মিলিয়ে এর আবেদন ও প্রাসঙ্গিকতা পাঠকের হৃদয়কে একটি মহৎ অনুভবে জাগরিত করে, তার অন্তরে প্রতিফলিত করে জগৎ ও জীবনের অদেখা রূপ ও ভাব।

*পদ্মরাগ* উপন্যাসে বাস্তব জীবন সেই সঙ্গে জীবনস্বপ্নের সংঘাতময় রূপটি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ পরম যত্নে মমতার আন্তরিকতায় এঁকেছেন। এ উপন্যাস নিয়ে খুব আলোচনা হয়নি। সমাজসংস্কারক রোকেয়া তাঁর সাহিত্যিক সত্তারই পরিবর্ধিত রূপ। তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক সত্তাই সমাজের নানা বিচিত্র দিককে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছে। আজকের নারী আন্দোলনের বক্তব্য বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শকেই তুলে ধরে। তাঁর বিভিন্ন লেখা বিশেষ করে উপন্যাসে এই প্রসঙ্গই

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে : "বেগম রোকেয়া নারীর মানবাধিকার বা নারী মুক্তির আন্দোলনে উজ্জ্বল ধ্রুব তারা। ....নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে পরিবার থেকে রাষ্ট্রের প্রতিটি পর্যায়ে, উচ্চবিত্ত বিত্তহীন প্রতিটি স্তরে। ....আশ্চর্য হলেও সত্য যে এক এক আইনে নারীকে এক একভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।"[৪] *পদ্মরাগ* উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা এভাবেই আজকের দিনে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।

## ।। দুই ।।

বেগম রোকেয়ার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবনা, 'মুক্তিবাদিতা', 'কৌতুকপ্রিয়তা'—"[৫] সবই রয়েছে এই রচনায়। তাঁর ভাষা সরল, ভঙ্গি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে সরস। তারিণী ভবনের মেয়েদের কৌতুকালাপ উপভোগ্য। অন্যদিকে প্রতিটি চরিত্র হৃদয়ের গভীরতায় অনন্য। সেবায়, পরার্থপরতায়, প্রীতি, সৌহার্দ ও মমতায়. তারা প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণা তবু তারা সমাজ-পরিত্যক্তা।

জয়নব ওরফে সিদ্দিকা উপন্যাসের নায়িকা। তারিণী ভবনে তার নতুন নাম হয় পদ্মরাগ। সামাজিক অবিচারের শিকার ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীদের মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে। দীনতারিণী, সৌদামিনী, হেলেন, ঊষা, সাকিনা রাফিয়া জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই লাঞ্ছিতা, নিগৃহীতা, নির্যাতিতা। তাদের সকলেরই সংসার জীবন ব্যর্থ। হৃদয়ের 'আগুন' গোপনে রেখে তারা কাজ করে চলেছে। এক লক্ষ্যে এক প্রতিজ্ঞতায় জীবনকে তারা জয়ী দেখতে চায়। সেবায়, করুণায়, মানবীয় মাহাত্ম্যে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে। ধর্ম-সংস্কারের বেড়া ভেঙে তারা হয়েছে একাত্ম। দেশ-কালের ভেদাভেদ ঘুচে গেছে। দুঃখ বেঁধেছে সাম্য মৈত্রীর বন্ধন। হৃদয় দিয়ে তারা হৃদয় আবিষ্কার করেছে। তাই সহজেই পথহারা-দিকহারা সিদ্দিকাও তাদের আপন হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হৃদয়ের নিভৃতিকে পরম শ্রদ্ধায় সম্মানের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলেছে। এই রুচিবোধ. পরিশীলিত মন ও মানসিকতা রোকেয়ার প্রার্থিত সুন্দর জীবনবিন্যাস ও শিক্ষার আদর্শকে স্পষ্ট করে তোলে। দুঃখকে তিনি 'আগুন' নামে অভিহিত করেছেন। এই আগুনেরও রয়েছে সৌন্দর্য। মেঘের চারপাশে বিদ্যুৎ লেখার মত এই সৌন্দর্য ব্যক্তিত্বকে দিয়েছে শক্তি ও সাহসের ঐশ্বর্য। এই সব রমণীর সবাই রোকেয়ারই প্রতিরূপ। এক দিকে তারা বিদ্রোহী, অন্যদিকে তারা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রোকেয়া বিদ্রোহ করেছেন, আপোষও করেছেন। কিন্তু চিরকাল সংগ্রাম করেছেন কুসংস্কার, গোঁড়ামি, কু-শিক্ষা, অ-শিক্ষা ও রুচিহীনতার বিরুদ্ধে। সে-অর্থে রোকেয়ার সমস্ত নারীচরিত্র প্রগতিশীল ও আধুনিক। শিক্ষা তাদের জীবনের অলঙ্কার এবং এ শিক্ষাই মনে হয় প্রমথ চৌধুরীর কাঙ্ক্ষিত 'স্ব-শিক্ষা'।

কলকাতার লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার তারিণীচরণ সেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দীন-তারিণী দেবী। সতরো বছর বয়সে বিধবা সন্তানহীনা এই নারী রোগ ও বৈধব্য যন্ত্রণায় মুমূর্ষু অবস্থা থেকে বেঁচে উঠলেন। চার বৎসর পর তিনি দুঃস্থ নারীদের সেবার জন্য খুললেন তারিণী ভবন, আত্মীয়-স্বজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে এই বিধবা-আশ্রমের সঙ্গে একটি বিদ্যালয়, নারীক্লেশ নিবারণী সমিতি নামে একটি সভা ও একটি আতুর আশ্রম স্থাপন করেন। তার মতে; "পরসেবা করার সৌভাগ্য কি সবার হয়?"

পদ্মরাগের শুরু নাটকীয়। নৈহাটি স্টেশনে ছদ্মবেশী সিদ্দিকার আসল নাম জয়নব। নীলকর চার্লস রবিনসনের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য পুরুষ ছদ্মবেশে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। মি. লতীফ আলমাসের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল। পিতামহের বর্তমানে লতীফ পিতৃহীন হওয়ায় সম্পত্তির অধিকার-বঞ্চিত হন। তার দুই বোন রশীদা ও রফিকাও সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। সম্পত্তি জ্যেষ্ঠতাত হাজী হাবীব আলম উত্তরাধিকার সূত্রে পান। তারই অনুগ্রহে লতীফ ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাত গেলেন। বিলাত যাবার আগেই তার বড় বোন রশীদার ননদের সঙ্গে লতীফের তিন বছর পর বিয়ে হওয়ার শর্তে 'আকদবন্ত' হয়ে রইল। লতীফ ফিরে এলে হাজী হাবীব আলম লতীফের বাগদত্তা কন্যার সম্পত্তির অংশ আগেই তার নামে লিখে দেওয়ার জন্য বৈবাহিক পরিবারে চাপ সৃষ্টি করলেন। সোলেমান ন্যায়, সাধুতা ও ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। আঠার বছর হওয়ার পূর্বে কন্যা তার সম্পত্তির ভাগ বুঝে নিতে পারে না। তার এই মতামতের প্রেক্ষিতে হাজী হাবীব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লতিফের বিয়ে অন্যত্র ঠিক করলেন। জনৈক ধনী জমিদারের কন্যাকে চাপে পড়ে লতীফ বিয়ে করতে বাধ্য হলেন।

জয়নবের উক্তিতে তার ভাইয়ের মনের কথা জানা যায়, 'ভাইজান এই রূপ নিষ্ঠুর অবমাননার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।"

তিনি জয়নবকে বলেছিলেন, "তুই জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ। মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য যাহাতে তোকে কোন দুরাচার পুরুষের গলগ্রহ না হইতে হয় আমি তোকে সেই রূপ শিক্ষাদীক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিব। তোকে বাল-বিধবা কিংবা চির কুমারীর ন্যায় জীবন-যাপন করিতে হইবে; তুই সেজন্য আপন পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়া।" শুধু তাই নয়— "সে দিন আমার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইল। সেইদিন ভাইজান আমাকে আমার ভাগের সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া দলিল-পত্র সমস্ত আমাকে দান-করিলেন।" এর আগেই তার ভাই সোলেমান জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় বোনকে ধৈর্য ধরে শেখালেন।

লতীফ যাকে বিয়ে করলেন তার নাম ছিল সালেহা। মুখরা ও কলহপ্রিয় সালেহার সঙ্গে এই বিয়ে সুখের হয়নি। অন্য দিকে লতীফের বাগদত্তা জয়নবের ভাই মহম্মদ সোলেমান চুয়াডাঙ্গার নীলকর সাহেবের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে উনিশ বছরের যুবক পুত্রসহ নিহত হলেন। চার্লস জেমস রবিনসন এই হত্যার আসামি হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য জয়নবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। অত্যাচারের অতিষ্ঠ হয়ে জয়নব পালিয়ে যাবার পথে ছদ্মবেশে চাতুরির সঙ্গে তারিণী ভবনে আশ্রয় পেল। সেখানে তার নতুন নাম হলো সিদ্দিকা। ঘটনাক্রমে অসুস্থ লতীফও আশ্রয় পেল সেই তারিণী ভবনে। সুস্থ হয়ে লতীফ গৃহে প্রত্যাগমন করলে কিছুদিন পর তার পত্নী বিয়োগ হল। ক্রমশ লতীফ এবং সিদ্দিকা পরস্পরের প্রকৃত পরিচয় পেলেন।

কাহিনীর শেষে সিদ্দিকার পরিণতি রোকেয়ার প্রার্থিত জীবনাদর্শেরই রূপায়ণ। সিদ্দিকার বিদায়ক্ষণে তার ললাট চুম্বন করে তারিণী বলেছিলেন, তুমি যে সমাজের সমূহ কল্যাণের নিমিত্ত দাম্পত্য জীবন জলাঞ্জলি দিলে, "ইহাতেই আমার অধিক দুঃখ হইতেছে। কৃতঘ্ন সমাজ তোমার এ অমূল্য দানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবে না। সমাজ সেবা করিতে গেলে আজীবন অভিসম্পাত কুড়াইতে হইবে।" এ বিষয়ে সিদ্দিকার নিজের মত, "আর ফিরিবার উপায় নাই। সেদিন তাহাকে স্পষ্টই বলিয়াছি 'তুমি তোমার পথ দেখ'।"

সিদ্দিকার নিজের সম্বন্ধে ভবনটি হচ্ছে "সিদ্দিকা নিজেকে 'চিরকুমারী' জ্ঞান করিবেন না, কারণ চিরকুমারী নিঃস্ব তাহার পুণ্য হৃদয় অবলম্বনহীন। তদ্রূপ তিনি নিঃসম্বল দরিদ্র জীবনভার অতি দুর্বহ। তিনি নিজেকে বিধবা মনে করিবেন, সেহেতু বিধবার স্বামীস্মৃতিরূপ বহুমূল্য সম্পদ থাকে।"

"সতীর দেবতা পতি, জীবনের সার,
তেই যাচি পূজিবারে চরণ তার"—

রোকেয়ার নারীচরিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনের অভিসারী। একদিকে আদর্শবাদী অন্যদিকে প্রখর বাস্তববুদ্ধি জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করেছে এই নারীচরিত্রের। নারী পুরুষের সহযাত্রী। এই বিশ্বাসে রোকেয়া অকপট থেকেছেন। সিদ্দিকা কখনও তাঁর আত্মমর্যাদা নষ্ট হতে দেননি। তাই তাঁর সংগ্রামী সত্তা ক্লান্তিহীন, আনন্দদীপ্ত ও উজ্জ্বল। প্রেমিকের মাথাও তাঁর সামনে শ্রদ্ধাবনত। লতীফ "সিদ্দিকার লজ্জানম্র পদ্মরাগবৎ আরক্ত বদনখানি দেখিতেছিলেন, আর হয়ত ভাবিতেছিলেন,—

"প্রণয়ের পুরস্কার থাকে যদি অভাগার
এ রোদন পশে যদি বিধাতার শ্রবণে,
জন্মান্তরে পার আমি এরমণী রতনে।"

জন্মান্তরে 'ত' পরের কথা... ট্রেন চুয়াডাঙ্গায় আসিয়া পৌঁছিল আর কি। ... লতীফ সিদ্দিকার হাত ধরিয়া নামাইলেন। এই তাহাদের শেষ দেখা। ভালবাসা মিথ্যা নয় কিন্তু প্রত্যাখানকারী স্বামীকে গ্রহণ করাও সম্ভব নয়।" রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার অমিতের উচ্চারণই যেন রমণীকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে শুনি, "মোর লাগি করিওনা শোক আমার রয়েছে কর্ম আমার রয়েছে বিশ্বলোক।" এই বিশ্বলোকের দায়িত্ব নারীপুরুষ উভয়েরই। নারীসহযাত্রীই বটে। সিদ্দিকার মধ্যে যে বিদ্রোহী সত্তা আছে তা আপোষহীন, এই আপোষহীন সত্তাই আবার মাতৃত্বে মহিমাময়ী। চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে সিদ্দিকা ভ্রাতুষ্পুত্রকে লালন করবে, জমিদারি দেখবে, সেই সঙ্গে "পতিত মুসলমান সমাজের ললনাবৃন্দকে জাগ্রত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।"

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন নারীমুক্তির কথা বলেছেন। এ মুক্তির প্রথম শর্তই শিক্ষা। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট এবং সোচ্চার ছিলেন। এ শিক্ষাকে তিনি দু-ভাবে দেখতেন। একদিকে তিনি চাইতেন শিক্ষা যেন নারীকে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য যোগ্য করে; অন্যদিকে এই শিক্ষা তাকে যথার্থ মানুষরূপে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। যথার্থ শিক্ষার অভাবই সমাজে অসৎ-বিবেকহীন মানুষের ভীড় বাড়ায়। এভাবেই তার *পদ্মরাগ* উপন্যাসে একদিকে বিবেকবান নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী পরদুঃখকাতর মানুষ; অন্যদিকে স্বার্থপর লোভী অসৎ কলহপ্রিয় মানুষ লক্ষ করা যায়।

লতীফ কর্মজীবী মহিলাদের সাহায্যের জন্য বাড়ানো হাতকে দেখে ভেবেছিলেন, "সে হাত কেমন স্বাধীন"। সালেহা, শ্যামা, হাজী হাবীব আলম, উকীল আব্দুল গফুর এই সমস্ত মানুষের দল সুখের ঘরে অবলীলায় আগুন দিয়েছে। অন্যদিকে সিদ্দিকা, তারিণী, সৌদামিনী, হেলেন, রাফিয়া, সকিনা, কোরেশা-বি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছে বেঁচে থাকার শিক্ষা। নিজ নিজ জীবনের ধর্ম ও সমজের গণ্ডি অতিক্রম করে প্রবেশ করেছে বৃহত্তর মানব সমাজে, মানুষের পাশে মানুষের মাঝেই বেঁচে থাকার নতুন জগতে। সৌদামিনীর বিয়ে হয় বিপত্নীক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি নিজেও সৎমায়ের স্নেহে মানুষ। কিন্তু সৎমাকে তিনি পর জানেননি। সৌদামিনী বিয়ের পর আপ্রাণ চেষ্টাতেও মাতৃহারা কন্যা জাহ্নবী আর নগেনকে আপন করতে পারলেন না। ননদিনী শ্যামার চক্রান্তে হলেন গৃহহারা, স্বজনহারা। অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরতে হল তাকে।

সৌদামিনীর মা এ কথা বুঝতেন না। জীবনের বাঁধা গণ্ডির বাইরে দৃষ্টিপাত করতে তার বড় ভয়। তাই তিনি বলতেন, "তোর কথা আমি বুঝতে পারি না— তুই ছেলে দু'টোকে পোষ মানিয়ে নিতে পারলি না?" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বোতাম

আঁটা জামার নিচে পোষ মানা প্রাণকে ধিক্কার দিয়েছিলেন।" বেগম রোকেয়ার নারীরা কিন্তু সহজেই সেই সমাজের গৃহবন্দী জীবনকে জীর্ণবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করেছে। প্রমথ চৌধুরীর আকাঙিক্ষত 'স্বশিক্ষিত' মানুষের মত তারা উজ্জল চরিত্র-মহিমায়, স্বাবলম্বনে দৃঢ়চিত্ত, নির্ভয়। তারা বিপন্ন মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রমাণ করে তাদের আত্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় ভীত। বিপন্ন শত্রুকেও মানুষ ভেবে সাহায্য, সেবা করার সাহস ও বীরত্বে তারা যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছে। এই সব সাহসী চরিত্র সৃষ্টির পেছনে বেগম রোকেয়া যে সমাজ, যে জীবনের কথা ভেবেছেন তা মুক্তবুদ্ধি চিন্তা-চেতনার জগৎ সৃষ্টির জন্য। তার চরিত্রগুলিকে তিনি দুঃখ উত্তরণের সুযোগ দিয়েছেন। জীবনের পরিপাশকে তৈরি করে নিয়ে বেঁচে থাকতে অনুপ্রাণিত করেছেন। সৌদামিনীকে বলতে শুনি, "এখন দেখি হৃদয়টা বৃহৎ— বিশ্বব্যাপী হইয়াছে, এখন আর ওরূপ ক্ষুদ্র ঘটনায় সামান্য অনাদর অবহেলায় হৃদয় আলোড়িত হয় না।"

সৌদামিনী কোরেশা-বি দুইজন দুই ধর্মে বিশ্বাসী হলেও সমাজে তারা একইভাবে নির্যাতিতা। স্বার্থান্ধ ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডিতে তারা পদে পদে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত। সকলের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য তাদের দায়ী করা হয়েছে। সুবিচার মেলেনি কোথাও। সংসারে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে সব সময় ব্যক্তিকে এককভাবে বেগম রোকেয়া দায়ী করেননি। কোরেশা-বি-র স্বামীর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "দশচক্রে ভগবান ভূত।" তিনি দায়ী করেছেন অশিক্ষা কুশিক্ষা ও কূপমণ্ডুক সমাজ-ব্যবস্থাকে। এই পরিবেশ একটি শিশুর বড় হয়ে ওঠার জন্যও অনুকূল নয়। শিশু জাহ্নবী চঞ্চলমতি, অস্থির। কত অনায়াসে অবুঝ জাহ্নবী নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। স্নেহের নিরাপদ আশ্রয়কে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। কমরজ্জামানের মৃত্যু কোরেশা-বি-র জীবন ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তবু তারিণী ভবনের মত আশ্রয় কেন্দ্রই মেয়েদের জন্য শেষ আশ্রয় বলে বেগম রোকেয়া মনে করেন না। সিদ্দিকাই সে-পথের সন্ধান দেয় যখন সে বিয়ে করে পুত্রবতী হয়ে সংসারে ফিরে যাওয়ার চেয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রকে মাতৃস্নেহে বড় করা এবং সমাজসেবা করা শ্রেয় জ্ঞান করে: "নারী-ক্লেশ-নিবারণী-সমিতি নামটি শোনা মাত্র লতীফের ভগিনী রফীকা উচ্চহাস্যে বলেছিলেন "নারীক্লেশ নিবারনী সমিতি? এমন নামতো কখনও শুনি নাই। পশুক্লেশ নিবারণী সভা আছে জানিতাম।" বেগম রোকেয়ার মানবিক মর্যাদা ঐ সমাজ ব্যবস্থায় কতটা আহত ছিল এই উক্তিতেই তা বোঝা যায়। তিনি শিক্ষিত সুরুচি সম্পন্ন একটি জীবন ব্যবস্থার কথাই ভাবতেন।

সততা, আন্তরিকতা, বিশ্বাস, নীতিবোধ ইত্যাদি যেসব গুণে মানুষের চরিত্র উন্নত হয়, সেই সব গুণের কারণেই রাফিয়া হয়েছিলেন পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার, স্বামীপরিত্যক্তা। তাঁরও আবার উচ্চশিক্ষিত ব্যারিস্টার স্বামী, যার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করে নিজেকে তাঁর উপযুক্ত স্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইংরেজি শিখেছিলেন। এক কন্যার জননী এই রাফিয়া বেগম এর প্রতিদানে স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন তালাকনামা। শিক্ষা যদি মানুষকে সত্যিকার মানবিক মূল্যবোধই না দিতে পারে, সে-শিক্ষার কি মূল্য আছে? বেগম রোকেয়া সেই কারণেই বারবার প্রকৃত শিক্ষার কথা বলেছেন, যে-শিক্ষা মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে সার্থক হতে সাহায্য করে। স্বনির্ভর, স্বাধীন, সচেতন মানুষই নেতৃত্ব দিতে পারে সমাজের। বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার স্বামীর জীবন থেকে মুক্তি লাভ রাফিয়ার জন্য অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়েছে।

বিদেশিনী হেলেনও ভালবাসা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দিয়ে হয়েছেন ভাগ্য-বিড়ম্বিতা। তাঁর ভালবাসা তাঁর স্বামীর কঠিন হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেনি। হেলেন ভালবাসার বাঁধনে তাঁর স্বামীকে বাঁধতে পারেনি। কিন্তু মদ্যপ চরিত্রহীন পাগল স্বামীর সঙ্গে ইংল্যান্ডের আইন তাঁকে চিরকালের জন্য বেঁধে রেখেছে। বেগম রোকেয়ার ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে সকিনার উক্তিতে, "এই ইংল্যান্ড— এই পুঁতি গন্ধময় পচা ইংল্যাণ্ড আবার সভ্যতার দাবী করে।" শিক্ষিত সমাজও নারীর মর্যাদা নিয়ে বিচলিত নয়। কথাটা ঘুরিয়ে বললে এই দাঁড়ায়, নারীর মর্যাদা রক্ষিত না হলে শিক্ষাব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা মানুষের গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। হেলেন যখন সকিনাকে মনে করিয়ে দিয়েছে (যে সে নিজেও দেশের আইন ও বিচার পদ্ধতির 'বলি') তখন সকিনার উত্তর হল, "আমাদের দেশ ত অসভ্য পরাধীন দাসাধম দাস— তাহার সর্বাঙ্গে কলঙ্ক-কালিমা। কিন্তু তোমাদের যে সাদা ধবধবে দেশ।" এই উক্তির প্রামাণিকতা আজকের বিশ্বে সর্বত্র বিরাজমান। মানুষ হিসেবে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের কল্যাণ আর মঙ্গল নিহিত। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

সকিনার মতে, তার স্বামী তাকে অপমান করেছিলেন। সে-অপমান সমস্ত নারী জাতির অপমান। সুন্দরী সকিনা চরিত্রহীন মাতাল স্বামীর মিথ্যা অপবাদে হয়েছেন নিগৃহীতা, লাঞ্ছিতা। সকিনার ভাইয়েরাও তার দায়িত্ব নিতে পারবেন না। বেগম রোকেয়া লিখেছেন, "ভাগ্যহীনাদের জন্য মৃত্যু এত সহজ নহে।" তারিণী কর্মালয়ে প্রবেশকালেই তাকে আত্মীয়-স্বজনের প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অবশেষে রাফিয়ার সহায়তায় তিনি সেখানে আশ্রয় লাভ করেন।

কাপুরুষ স্বামীর স্ত্রী উষা তাঁর এয়স্ত্রীর চিহ্ন শাঁখা হাত থেকে খোলেন না। তারিণীর কাছে এ একটা কুসংস্কার ছাড়া কিছুই না। তিনি মনে করেন, মুসলমান সমাজে এ ধরনের কুসংস্কার নেই এটা সুখের বিষয়। বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল[৭] সাত বৎসরের উষাকে একা ঘরে ফেলে স্বামী জানালা পথে পালিয়ে গেল। ডাকাতরা লুণ্ঠন শেষে উষাকে বেঁধে নিয়ে চলল। পথে কংগ্রেস কমিটির তিনজন ভলিন্টিয়ার তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে রেখে আসে। কিন্তু গৃহে তার স্থান হয় না। বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে তার বাড়িতে সে পালিয়ে আসে। কিন্তু যখন কেষ্টার বউ-এর কাছে জানতে পায় যে কেষ্টার মা তাকে পতিতা বৃত্তির জন্য বিক্রি করে দিয়েছে তখন সে কেষ্টা ও কেষ্টার বউ-এর সঙ্গে লুকিয়ে কলকাতায় আসে। তারপর কেষ্টার শাশুড়ীর সাহায্যে তারিণী-গৃহে আশ্রয় পায়। তিনি তিন নম্বরের জন্য বিএ ফেল করেও ট্রেনিং পাশ করে তারিণী ভবনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হয়েছেন। সিদ্দিকার প্রশ্ন বেগম রোকেয়ার অন্তরের প্রশ্ন, "সমাজের এইসব নালীঘায়ের কি ঔষধ নাই?"

উত্তর সকিনা দিয়েছে, "আমি দেখাইতে চাহি যে, দেখ, তোমাদের 'ঘরকরা' ছাড়া আমাদের আরও পথ আছে। স্বামীর ঘর করাই নারী জীবনের সার নহে। মানব-জীবন খোদাতালার অতিমূল্যবান দান— তাহা শুধু রাঁধা-উনুনে ফুঁ পাড়া আর কাঁদার জন্য অপব্যয় করিবার জিনিস নহে। সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিতেই হইবে।"

তারিণী বিদ্যালয়ের বিংশবর্ষীয় জুবিলী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে স্কুল ও সমাজের একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। বেগম রোকেয়ার কৌতুকপূর্ণ মনটির সাক্ষাৎ এ অংশের বিচিত্র চরিত্রগুলোর সংলাপে পাওয়া যায়। এখানে সবগুলো চরিত্রকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের সহজতায় দৈনন্দিনতার মধ্যে সাজানোর অপূর্ব কৌশল উপন্যাসটিকে ঘাটনার আবর্তে হারিয়ে যেতে না দিয়ে এর গতি পথকে করেছে সংহত। উপন্যাসটি পড়লে মনে হয়, এর সবগুলি চরিত্র মিলে এক বিরাট মহীরুহ সৃষ্টি হয়েছে, যে-মহীরুহের শেকড়ে রয়েছে চরিত্রগুলোর রক্তক্ষরণ ও দাহ। আর অন্য দিকে এই মহীরুহ বিশাল আকাশের নিচে অজস্র পাতায় ফুল-ফলে আমন্ত্রিত পাখিদের গানে-গানে, আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে। এই আনন্দ কোলাহল মুখরিত জীবনসৃষ্টি এই চরিত্রগুলোর কৃতিত্ব। দুঃখকে অতিক্রম করতে পেরেছে বলেই নীল আকাশের নিচে এর সবুজ পাতার আনন্দ কলবর জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার হাতছানি দেয়।

বিদ্যালয়ের বিচিত্র সব সমস্যা। অভিভাবকদের অনুযোগ, অভিযোগের শেষ নেই। শিক্ষা সম্পর্কে গোটা সমাজের ধারণার নানা দিক ধরা পড়ে। অগ্রবর্তী প্রজন্ম

ও তাদের অভিভাবদের মাঝের চিন্তা ও চেতনার ব্যবধান শিক্ষাকে একদিকে অপরিহার্য অন্যদিকে দুঃসাধ্য করে তোলে।

সমাজ মেয়েদের মানুষও মনে করে না। "মেয়েলী বুদ্ধি লইয়া আর কত ভাল রূপে কাজ করিবেন? স্কুলের কর্ম নির্বাহক সভায় যদি কোন পুরুষ থাকিত তবে দেখিতেন, স্কুল পরিচালনা কিরূপে হয়।" জনৈক অভিভাবকের চিঠি থেকে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হল।

জোনাব আলী লতীফের মায়ের মামা। লতীফের সম্পর্কে নানা। চরিত্রটি লতীফের স্মৃতির অন্ধকারে আলো ছড়িয়ে দিবার জন্য সুনিশ্চিতভাবে উপন্যাসে প্রবেশ করেছে।

তারিণী ভবনের নারী চরিত্রগুলি দুঃখ-বেদনাকে আত্মস্থ করে স্থির। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তারা মানুষ। সমাজে মানুষ হিসেবে স্থায়ী মূল্যে তারা আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত। আজকের জীবন ও সমাজের প্রাসঙ্গিকতায় বেগম রোকেয়ার *পদ্মরাগ* উপন্যাসের প্রকৃত মূল্যায়ন প্রয়োজন।

।। তিন ।।

আধুনিক উপন্যাস রচনার মাধ্যমটি বেগম রোকেয়াকে যে আকৃষ্ট করবে এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বেগম রোকেয়া ছিলেন মূলত সমাজসংস্কারক। তাঁর সমস্ত লেখাই ছিল মানবতার জন্য একটি গভীর দুঃখ মমতায় মণ্ডিত, তাঁর রুচিশীল পরিশীলিত মনের পরিচায়ক। তিনি চিহ্নিত করেছিলেন ব্যক্তি জীবনের পরাজয়ের পেছনে সমাজ জীবনের অশুভ চক্রান্ত। সমাজ জীবনের দিকভ্রষ্ট ছিন্ন ভিন্ন রূপের জন্য দায়ী করেছিলেন ব্যক্তি জীবনের অসম্পূর্ণতা। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্তর্মুখি সমাজ ছিল অশিক্ষিত অজ্ঞান মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং শিক্ষা এবং নারীশিক্ষা, নারীর আত্মবিকাশ, আত্মপ্রতিষ্ঠা, নারীর কল্যাণী মমতাময়ী রূপই সমাজকে রক্ষা করতে পারে— একথা মনে রেখেই তিনি *পদ্মরাগ* উপন্যাস রাচনায় হাত দিয়েছিলেন। *পদ্মরাগ* উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে তিনি বইটির সমালোচনা করে নিজেই লিখেছিলেন, "আমার এ কাব্যে সামাজিক নিয়ম রক্ষা হয় নাই— আমি কেবল বিশ্ব-প্রেমিকের চিত্র আঁকিয়াছি।" একথায় স্পষ্টই বোঝা যায় মানুষ সংসারে যতটুকু সত্য, সমাজেও ততটুকু সত্য। সংসারের পথে জীবন যদি পথ না পায় সমাজের বৃহৎ পরিসরে তার জায়গা তাকে খুঁজে নিতে হবে। নিয়ম রক্ষা করে

বাহবা কুড়ানো নয়, জীবনের জন্য এগিয়ে যাবার পথ করে দেওয়াই শ্রেয়। সংসারের চার দেয়ালের বাইরেও মানুষের জন্য মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন।

*পদ্মরাগ* উপন্যাসে কেন্দ্রীয় কাহিনী আবর্তিত হয়েছে লতীফ ও সিদ্দিকার জীবন নিয়ে। পিতামহের বর্তমানে পিতার মৃত্যু হওয়ায় লতীফ, রশীদা ও রফিকা সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হলেন। দয়ামায়া ও প্রেমহীন সংসারে মুহূর্তে লতীফের বুদ্ধিমতী মা দাসীর অধম হয়ে সন্তানের সুশিক্ষার জন্য আত্মবলিদানের প্রস্তুতি নিলেন। জ্যেষ্ঠতাত হাজী হাবীব আলমের অনুগ্রহে লেখাপড়া শিখলেও লতীফ বড় চাচার লোভের শিকার হলেন। বড় বোন রশীদার ননদ জয়নবের সঙ্গে আকদ হলেও তাকে ঘরে আনতে পারলেন না। জয়নবের ভাই এবং লতীফের দুলাভাই বিয়ের আগে জয়নবের ভাগের সম্পত্তি তার নামে লিখে দিতে অস্বীকার করায় সম্পত্তির লোভে বড় চাচা তাকে সালেহার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। ভাই সোলেমান বোন জয়নবকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করলেন। কিন্তু নীলকর সাহেব রবিনসনের ষড়যন্ত্রে সোলেমান ও তার পুত্রের মৃত্যু ঘটলে জয়নব পুরুষের ছদ্মবেশে নিরুদ্দেশ হলেন। জয়বন সিদ্দিকা-রূপে তারিণী ভবনে আশ্রয় পেলেন। সেখানে তার নতুন নামকরণ হল *পদ্মরাগ*। *পদ্মরাগ* বহুমূল্যবান মণি। সিদ্দিকা সেখানে ক্রমে ক্রমে পরিচিত হলেন সৌদামিনী, ঊষা, কোরেশা-বি, হেলেন, রাফিয়া, আরো অনেকের সঙ্গে। তিনি বুঝলেন ব্যক্তিগত দুঃখ ভুলতে হলে মানুষের দুঃখভাগী হতে হবে। মানুষের সেবার মহানব্রত গ্রহণ করে তিনি আত্মস্থ হলেন। তাঁর হৃদয় প্রশান্ত হল। পরহিত ব্রতে আত্মনিয়োগ করে হলেন আত্ম-সংযমী। তাই রবিনসনকে চিনেও তার সেবা করতে কুণ্ঠিত হননি। যখন জানলেন লতীফই তার স্বামী তখনও তিনি আত্মসংযমের পরিচয় দিলেন আত্মসম্মান রক্ষা করে। সংসারের ছোট ঘরে ফিরে না গিয়ে রইলেন দুর্গত মানবের সেবায়, আত্মনিয়োগের মহান কর্মে নিয়োজিত।

এই মূল কাহিনীর সঙ্গে মিশেছে আরো বিচিত্র কাহিনী। সেখানে লেখিকা সমাজের বিচিত্র মানুষের বিচিত্র দুঃখ-বেদনার কাহিনী তুলে ধরেছেন তার বক্তব্যের সমর্থনে। অনগ্রসর সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত লোভ, হিংসা ও কুসংস্কারের বলি মেয়েরা। এখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব মেয়েদের জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তির উপায় তিনি ইঙ্গিত করেছেন শিক্ষা। তবে তিনি বলেছেন, "জমিদার পারিবারের কন্যাগণ যেমন লেখাপড়া, শুধু ভাষাশিক্ষা এবং নানারূপ সূক্ষ্ম সূচিকার্য, উল বুনন ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া থাকেন, সিদ্দিকাও তাহাই

জানিতেন। সুতরাং সিদ্দিকা দেখিলেন, তাঁহার কোন বিদ্যাই পয়সা উপার্জন করিবার উপযোগী যোগ্যতা লাভ করে নাই।" এ অবস্থা মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়া বা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কাম্য নয়। সিদ্দিকাও অভিজ্ঞতার দিগন্ত বাড়াতে লাগলেন এবং নিজেকে জীবনের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করে নিতে লাগলেন। টাইপ করা শিখলেন, সেলাই ও রোগী সেবাও শিখলেন। এই হল বেগম রোকেয়ার চোখে নারী জাগরণ।

*পদ্মরাগ* উপন্যাসের ভাষা আন্তরিক ও প্রাঞ্জল। অতিকথন বাদ দিলে কাহিনী হৃদয়স্পর্শী। চরিত্রগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসায় স্পষ্ট ও জীবন্ত। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন শিক্ষা প্রচারে যত্নবান ছিলেন বলে প্রতিটি চরিত্রের সংযম ও রুচিবোধ প্রশংসনীয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের উপলব্ধি নারী-পুরুষের আচরণ ও ব্যবহারে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে; সৌজন্যবোধ, সরস কৌতুক, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, চরিত্র ও সংলাপকে দিয়েছে গতিবেগ ও চমৎকারিত্ব। নীতিবোধ, আত্মসম্মানবোধ মানুষকে দিতে পারে সত্যিকার দিগ্‌দর্শন। বেগম রোকেয়া তাঁর *পদ্মরাগ* উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের জীবনদৃষ্টিতে এ সত্যই তুলে ধরেছেন।

উপন্যাস জীবনের দলিল। সময়, দেশ-কাল ও জীবনকে বুঝতে হলে উপন্যাস ও লেখকের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। সমকালীন জীবনভাবনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে চিরকালীন সাহিত্য। *পদ্মরাগ* বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের মত মহীয়সী রমণীর জীবন ও ভূমিকাকে আমাদের সামনে মূর্ত করে তোলে—এ সার্থকতাও বিবেচনার সঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর কোলকাতা সাখাওয়াত স্কুলে বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর কলকাতা আলবার্ট হলে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। রোকেয়া সমাজসংস্কার ও চিন্তাশীল লেখিকা হিসেবে সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সাথে প্রথম সারিতে অবস্থান করছেন। একই সাথে তিনি সে-যুগে একজন জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, রাজনীতি-সচেতন, প্রগতিশীল, সাহসী ব্যক্তিত্ব ছিলেন; মননে চিন্তাভাবনায় শুদ্ধতম আদর্শ বাঙালি ছিলেন। *পদ্মরাগ* উপন্যাসটি রচিত হয় সম্ভবত ১৯১০ সালে এবং প্রকাশিত হয় সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে। তখন তিনি কলকাতা শহরেই ছিলেন। এ ভূখণ্ডে বাঙালি নারীর যেটুকু অগ্রগমন ঘটেছে তার ভিত তৈরি করে গিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া।

**টীকা**

১ বেগম রোকেয়া, ১৯২৪, পদ্মরাগ, বেগম রোকেয়া রচনাবলী, সম্পাদক : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ১৯৯৩, পৃ ২৮৭-৪২৭

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০৯, *গোরা*, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১০৯-৫৭২

৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩১, শেষ প্রশ্ন, শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ, নবম সম্ভার, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৩৮০, পৃ ১-২৫৭

৪ মোতাহার হোসেন সুফী, ১৯৮৬, *বেগম রোকেয়া: জীবন ও সাহিত্য*

৫ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ১৯৯০, করতালি পাওয়া না পাওয়া, ফরিদা প্রধান সম্পাদিত, বেগম রোকেয়া ও নারী জাগরণ, ১৯৯৫, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৬৩